তুর্কো – আফগান যুগে ভক্তি আন্দোলনের উৎস এবং বিকাশের কারণ কি ।ভক্তি আন্দোলনের এর অবদান কি ছিল?

Answer:-

তুর্কো- আফগান যুগে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। তুর্কি শাসনের প্রারম্ভিক পর্বে ভারতীয় সমাজে অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ প্রকট হয়ে ওঠে। শুধু তাই নয় হিন্দু সমাজের মধ্যেও জাতিভেদ, গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে হিন্দু সমাজে এক শ্রেণীর ধর্ম চিন্তাবিদগণ ধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে ভক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে, যে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন তা ভক্তি আন্দোলন নামে খ্যাত।

সুফি মতবাদ ভারতে প্রবেশের আগেই এদেশে ভক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের মধ্যেই এই আন্দোলন সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। সংস্কৃত 'ভজ' ধাতু থেকে ভক্তি শব্দের উৎপত্ত, এর অর্থ হলো ভজন। সুফি আন্দোলন যেমন অনুষ্ঠিত হয়েছিল মুসলমানদের নেতৃত্বে, তেমনি ভক্তিবাদী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল মূলত হিন্দুরা। সুফিবাদের মত ভক্তিবাদ হিন্দু ধর্মের সংস্কারের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তুর্কো- আফগান আমলে ভক্তি আন্দোলন বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বস্তুত: বৌদ্ধ ধর্মের পতনের পর এদেশে ভক্তিবাদী আন্দোলনের মতো এত ব্যাপক ও জনপ্রিয় আন্দোলন আর সংঘটিত হয়নি।

ভক্তিবাদের উদ্ভব:-

ভক্তিবাদী আন্দোলনের উদ্ভব সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। Maxweber ও Grierson মনে করেন যে, খ্রিস্টধর্ম থেকে একেশ্বরবাদ ও ভক্তির ধারণা এসেছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক যেমন অধ্যাপক ইউসুফ হোসেন, রোমিলা থাপার প্রমুখ ভক্তি ধর্মের উৎস ইসলাম ধর্মের মধ্যে নিহিত আছে বলে উল্লেখ করেন। ইসলামের একেশ্বরবাদ, সামাজিক সাম্য ও বিশ্বজনীন ভাতৃত্বের উপর ভিত্তি করে ভক্তি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। তবে ভারতীয় পণ্ডিতরা K. M. Panikkar, A. C. Banarjee, Srivastava প্রমূখ মনে করেন যে, প্রাচীন হিন্দু ঐতিহ্য থেকে ভক্তিবাদের উদ্ভব ঘটে। ভাগবত পুরাণে এই ভক্তি ধর্মের কথা উল্লেখ আছে। ভারতের বেদ ও উপনিষদের মধ্যে ভক্তি আন্দোলনের উৎস নিহিত আছে। Dr. R. C. Majumdar, A. L. Srivastava প্রমূখ ঐতিহাসিকের মতে, ভক্তি ধর্ম মূলত: ভারতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে Dr. R. C. Majumdar লিখেছেন- **"..... neither the theory of Islam, non it's practice, as regards the Hindus, cloud appeal to the latter as bringing a new message of equality of Man".**

বস্তুত বৈদিক হিন্দু ধর্মের মধ্যেই ভক্তিবাদের তত্ত্ব নিহিত ছিল। ঈশ্বরের পদে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণনের কথা বলা হয়েছে শ্রীমদ্ভগবদগীতায়। তবে ইসলামের সুফিবাদ ও ভক্তিবাদের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। সুফি সাধকরা রক্ষণশীল ইসলামী গোঁড়ামির বিরোধী ছিলেন, ভক্তিবাদও ছিল রক্ষণশীল হিন্দু ধর্মও সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন। উভয়ই প্রেম ও ভক্তির দ্বারা পরমাত্মা প্রাপ্তিতে বিশ্বাসী ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ভক্তি আন্দোলনের উৎস মহাধর্ম সংস্কারক শঙ্করাচার্যের একেশ্বর মতবাদের মধ্যে নিহিত। শংকরাচার্য সাফল্যের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে হিন্দু ধর্মকে এক সাধারন দার্শনিক পটভূমির উপর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

তবে শঙ্করাচার্য তার ধর্ম প্রচার জ্ঞান ও জ্ঞানযোগের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করায় তার ধর্মমত সাধারণ মানুষের সমর্থন সেভাবে লাভ করতে পারেনি। পরবর্তীকালে তাকে অনুসরণ করে রামানন্দ, কবীর ও চৈতন্যদেব সাধারণ মানুষের আকর্ষণ বৃদ্ধি করার জন্য মধ্যযুগে নির্বাণ লাভের তৃতীয় পথ ভক্তি বা ভক্তিবাদের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

বস্তুত: ইসলামের আগমনের ফলে এদেশের বহু নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। হিন্দুধর্মে সমাজের মধ্যে বহু কু-সংস্কার প্রবেশ করেছিল। মূর্তি পূজা, পুরোহিত তন্ত্র বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা সমাজ জীবনকে পঙ্গু করে তুলেছিল। হিন্দুদের রাজনৈতিক অধঃপতন তাদের জীবনে হতাশা ও অবসাদ এনেছিল। অদ্ভুত পরিস্থিতিতে মূর্তিপূজা বিরোধী ইসলাম ধর্মের আগ্রাসী নীতি থেকে হিন্দুধর্ম সমাজকে রক্ষার উদ্দেশ্যে ভক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। সুতরাং এটি শুধু ধর্মীয় বিপ্লব নয়, সমাজ বিপ্লবও ঘটে।

ভক্তিবাদের আদর্শ ও লক্ষ্য:-

ভক্তিবাদের মূলকথা হলো ভক্তির মাধ্যমে মানুষের মুক্তি। জ্ঞান বা কর্মের প্রয়োজন নেই, শুধু ভক্তির মাধ্যমে ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে মিলন হতে পারে। ' প্রপত্তি ' বা ঈশ্বরের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে মুক্তি সম্ভব। কৃষ্ণ, রাম, শিব, আল্লাহ সবাই ভক্তিবাদিদের মনে বিরাজ করতেন অর্থাৎ ভক্তিবাদী সাধকদের ঈশ্বরের একত্বে (unity of God) দৃঢ় বিশ্বাস। তারা প্রচার করেন ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তাঁরা জাতিভেদ ও সামাজিক বিভেদ বৈষম্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন এবং সামাজিক ভেদাভেদের পরিবর্তে মানুষের সার্বজনীন ভাতৃত্বের আদর্শ প্রচার করেন। মূর্তিপূজার বিরোধিতা করে তাঁরা প্রচার করেন ঈশ্বর নিরাকার ও বর্ণহীন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব মনের গভীরে। তাঁদের মতে, কোন ভক্ত তার মনের ভাষাতে ঈশ্বরকে আহ্বান করতে পারে। এজন্য কোনো বিশেষ ভাষা বা স্রোতের প্রয়োজন নেই অর্থাৎ এই নতুন ধর্মীয় চর্চায় পূর্বেকার জাঁকজমকপূর্ণ পূজা-পার্বণ, বলিদান প্রভৃতি রোহিত-এ ব্যক্তিগত ভক্তি ও প্রেমের বিকাশ ঘটে, এর সঙ্গে যুক্ত হয় অতীন্দ্রিয়বাদ।

আন্দোলনের বিকাশ ও নেতৃবর্গঃ-

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের ভক্তি আন্দোলনের সূচনা হয়। পরে তা উত্তর ও পূর্ব ভারতে সম্প্রসারিত হয়, ভক্তিবাদের উদ্ভব ও প্রচারে কয়েকজন সাধক ও অতীন্দ্রিয়বাদী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

ভক্তি আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত বৈষ্ণব শিক্ষক রামানুজ। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আবির্ভূত হন। তিনি বলতেন যে মায়া বন্ধন হয়, ভক্তি যোগের দ্বারা তার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তিনি জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরোধী ছিলেন। তিনি ভক্তি মতবাদ জনপ্রিয় করে তোলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে তাঁর প্রতি অনুপ্রাণিত হয়ে বহু সাধকের আবির্ভাব হয়।

দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতে ভক্তিবাদের বাণী বহন করে আনেন রামানুজের শিষ্য রামানন্দ। তিনি যে আন্দোলন করেছিলেন তার মূল কথা ছিল ঈশ্বরের ভক্তি, জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা ও নারী-পুরুষের সমান অধিকার। তিনি উচ্চ-নিচ, ব্রাহ্মণ শুদ্রের মধ্যে পার্থক্যের বিরোধিতা করতেন। তাঁদের আন্দোলনের ফলে সমাজে নিম্নবর্গের মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

রামানন্দের প্রধান অনুগামী ছিলেন কবীর। তিনিও একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। তাঁর কাছে রাম, হরি, আল্লাহ সবই এক। তিনি বলতেন হিন্দু-মুসলিম একই মাটির দ্বারা দুটি পাত্র বিশেষ মাত্র। তিনি ছিলেন সাম্যের প্রতীক, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের আদর্শ এবং জাতিভেদ প্রথার কঠোর সমালোচক। তাঁর রচিত দোহার মধ্যে দিয়ে কবীর অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেন।

ভক্তি আন্দোলনের ওপর প্রচারক ছিলেন মহারাষ্ট্রের রামদেব। তাঁর শিষ্যগণও সকল বর্ণ ও শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ভক্তি আন্দোলনের যুগে অপরাপর ধর্ম সংস্কারকের ন্যায় তিনিও ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাসী ছিলেন ও মূর্তি পূজা এবং ব্রাহ্মণদের আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধী ছিলেন।

কবিরের ন্যায় গুরু নানকও হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য চেষ্টা চালান এবং একেশ্বরবাদ তত্ত্ব প্রচার করেন।

এছাড়া তুলসীদাসের রচনাও উত্তর ভারতের সাধারণ মানুষকে ভক্তিবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। তাঁর রাম রাজ্যের আদর্শ গান্ধীজিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তুলসী দাসের মতো রাজপুতনা রানী মীরাবাঈ রাজপ্রসাদ ত্যাগ করে কৃষ্ণের আরাধনায় মত্ত হন। তাঁরও আবেদন ছিল ভক্তি ও শ্রদ্ধার মিশ্রন। মীরাবাঈয়ের মত সুরদাসও কীর্তনের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি নিবেদন করেন।

মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক ও সংস্কারক ছিলেন বাংলার শ্রী চৈতন্যদেব, যিনি সাধারন বাঙালির কাছে শ্রীগৌরাঙ্গ বা নিমাই নামে পরিচিত। জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি এবং ভক্তিবাদ জাগরণের জন্য নাম সংকীর্তন এই ছিল শ্রীচৈতন্যদেবের মূল বাণী। অনেকে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণেরও অবতার বলে মনে করেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে তিনি প্রেম ও ভক্তির বাণী প্রচার করেন। বঙ্গদেশে ধর্ম ও চিন্তার জগতে শ্রী চৈতন্যদেবের প্রভাব বর্তমানকালেও সমানভাবে অনুভূত হয়।

ভক্তি আন্দোলনের - দ্বিতীয় অংশ

তুর্কো- আফগান রাজত্বে ভারতের সমাজ জীবনে ভক্তি আন্দোলনের কতখানি প্রভাব আছে এবিষয়ে নানা মত আছে। তবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলন সমগ্র দেশব্যাপী এক জোয়ার এনে দিয়েছিল। এই আন্দোলন ছিল জনগণের আন্দোলন। ফলে জনসাধারণের মধ্যে গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল। ইসলাম ধর্মের আগ্রাসী নীতি থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে হিন্দু ধর্মের সংস্কার সাধন এবং হিন্দু মুসলমান ধর্মের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করাই ছিল এর উদ্দেশ্য।

এই আন্দোলনের ফলে পুরোহিত তন্ত্র, যাগ-যজ্ঞ ও ধর্মীয় অনুশাসন থেকে মানুষ অনেকটা মুক্ত হয়েছিল। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, অস্পৃশ্যতা, বহুবিবাহ ইত্যাদির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছিল। এই আন্দোলন ছিল মানবতাবাদি। রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য সকলে নারী জাতি ও অস্পৃশ্যদের মানবিক স্বীকৃতি দেন। তবে এই আন্দোলনের সব উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়নি। হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ব্যবধান কিছুটা কমে ছিল কিন্তু স্থায়ী উন্নতি হয়নি। তথাপি দুই ধর্ম পরস্পরকে বুঝেছিল। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সমন্বয় ঘটেছিল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সহনশীলতা বেড়েছিল।

ভক্তি আন্দোলনের নেতৃবর্গ স্থানীয় ভাষায় তাঁদের মত প্রকাশ করেন। যার ফলে আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় উন্নতি শুরু হয়। সুতরাং ভক্তি আন্দোলনের নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলা যায় যে, সামাজিক সাম্য ও সহনশীল সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথে হিন্দু সমাজকে কিছুটা এগিয়ে নেওয়ার কাজে ভক্তি আন্দোলন বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ধর্মীয় সহনশীলতা দৃঢ় হবার ফলে অর্থনৈতিক কাজকর্মেও গতি এসেছিল। এই ভক্তিবাদের প্রসারের মাধ্যমেই সুলতানি রাজত্বের সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটে।